ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৩০৯-৩২৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4120

মহেশখালির নামকরণের ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা

মুহাম্মদ ইসহাক
সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Maheshkhali is an important place in Bangladesh, an area rich in natural resources. Maheshkhali is a charming island surrounded by sea and mountains. It is well known at home and abroad for its sweet betel leaf, dry fish, salt and fish. Marine resources and forest resources have multiplied the importance of the island. The historic Adinath Temple is located in Maheshkhali. Adinath Pahar (Hill)/Mainakparvat is a place well known in history. It is the oldest cultural monument of Maheshkhali Island. Maheshkhali has two small separate islands named Sonadia and Matarbari. Maheshkhali is a coastal island in the southernmost part of Bangladesh's Cox's Bazar district. There are differences of opinion about the naming of this island. Once Maheshkhali's name was "Adinath-Maheshkhali". The naming history of Maheshkhali is not well known. There are myths and legends about the naming of Maheshkhali. Currently, Maheshkhali is widely discussed and known internationally due to geographical and economic (geopolitics, geostrategic and geoeconomic) reasons. Maheshkhali attracts many tourists every year from home and abroad. Maheshkhali is also an island of unique beauty and a sightseeing spot. Cyclones and natural calamities occur in coastal areas. It can also be seen in the history of Maheshkhali. In this article, an attempt has been made to investigate into the history of naming of Maheshkhali, the date of settlement, and the history of the development of Maheshkhali.

Key Words: Maheshkhali, Adinath Temple, Marine Resource.

ভূমিকা: বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে কক্সবাজার জেলায় মহেশখালি, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, মাতারবাড়ি, শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ রয়েছে। এই জেলার একটি উপজেলা হলো মহেশখালি। "বর্তমানে মহেশখালির অন্তর্গত তিনটি দ্বীপ-সোনাদিয়া, মহেশখালী ও ধলঘাট-মাতারবাড়ি-ন্যূনধিক তিন হতে সাড়ে তিন লাখ মানুষের বাসভূমি।"[১] চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড়ি দ্বীপ হলো মহেশখালি। গবেষকদের লেখায় কক্সবাজার জেলার পাহাড়ী বনজ সম্পদ এবং সামুদ্রিক সম্পদের প্রাচুর্য উঠে এসেছে। এছাড়া পর্যটন শিল্পের গুরুত্বও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২] এই জেলার বিভিন্ন

উপজেলার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মহেশখালি উপজেলা অন্যতম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। "এই উপজেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। এ দ্বীপের বনাঞ্চল থেকে যোগান হচ্ছে স্থানীয় ঘরবাড়ি ও খেতখামার তৈরির সরঞ্জাম, পান বরজের উপকরণ, লাঙল-জোয়াল, জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র, বাঁশ-বেত, শন-উলু, ঘর ও গোয়াল ঘরের ছাউনি ইত্যাদি।"[৩]

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার বিষয় মহেশখালির বিকাশের ইতিহাস। মৈনাক পর্বত, আদিনাথ পাহাড়, আদিনাথ মন্দির অথবা মহেশখালীর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখালেখি হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে মহেশখালির ইতিহাস এবং এর বিকাশ ইতিহাস নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। এ প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে: প্রথমত, মহেশখালি দ্বীপের নামকরণ; দ্বিতীয়ত, এ দ্বীপে জনবসতি কবে থেকে; তৃতীয়ত, মহেশখালির ইতিহাস ও পটভূমি।

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধান করার জন্য প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কক্সবাজারের ইতিহাস, চট্টগ্রামের ইতিহাস, মহেশখালি ও আদিনাথ মন্দিরের ওপর প্রকাশিত গ্রন্থাদি, এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত বিভিন্ন ইতিহাসধর্মী বই, নথিপত্র, গবেষণামূলক জার্নাল-নিবন্ধ, দেশি-বিদেশি পত্রিকা, গবেষকদের গবেষণাপত্র, পুস্তিকা, সুভেনির ও প্রাসঙ্গিক রচনাবলির ভিত্তিতে এ প্রবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে। প্রবন্ধটির আলোচনা প্রধানত ইতিহাস আশ্রয়ী, বর্ণনামূলক, পর্যবেক্ষণমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী।

মহেশখালির নামকরণ ও বিকাশের ইতিহাস

এ দ্বীপে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি, চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড়। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেও মহেশখালি দেশি-বিদেশি অনেকের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আধুনিক যুগে সমুদ্র-সম্পদ ও ভূ-সম্পদ একযোগে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্ষম বাংলাদেশের একমাত্র স্থান মহেশখালি।[৪] পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালির নামকরণের ইতিহাস সুবিদিত নয়।

মহেশখালি দ্বীপের নামকরণ নিয়ে নানা মতামত প্রচলিত আছে। আবার মহেশখালিতে কবে থেকে লোকজনের বসতি তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা

তত্ত্বনীধি প্রণীত *চট্টগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেন, "মহেশখালীকে আরাকানী ভাষায় 'মাহাজো' বলে থাকে। ইহা অতি পুরাতন দ্বীপ এবং কুতুবদিয়া হতে অনেক বড় ও লোক সংখ্যাও অধিক। তথাকার পর্বত শ্রেণীকে মৈনাক ও আদিনাথ বলে।"[৫] মৈনাক পর্বত বা আদিনাথ নিয়ে নানা রহস্য আছে। মৈনাক পাহাড় বা মহেশখালির চতুর্দিকে চকরিয়া, কুতুবদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার জেলা ও বঙ্গোপসাগর। অবস্থানগত কারণে এর রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর পটভূমি। আহমদ শরীফ নাথ সাহিত্যের কাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "আদিনাথ-মীননাথ কাহিনীর শুরু আট শতকে এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ কিংবা হাড়িপা-কানুপার কাহিনীর উদ্ভব তার পরে পরেই।"[৬] সুণীতিভূষণ কানুনগো *চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস* গ্রন্থে নাথ মতবাদ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "নাথ মতবাদের আবির্ভাব বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদকে নতুন পথে পরিচালিত করে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নাথ মতবাদের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে। নাথ মতবাদ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম এবং শৈব মতের সংমিশ্রণ। নাথ মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, আদিনাথ বা আদিবুদ্ধ তাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। আদিনাথের প্রথম এবং প্রধান পূজাস্থল হল মহেশ (মহেশখালী) দ্বীপ। এই দ্বীপের পর্বত শীর্ষে তাঁর প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ আদিনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে। উত্তর চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের আদিনাথ নাথ ধর্মের প্রধান দেবতা হিসাবে পূজিত হন।"[৭] চট্টগ্রামের ইতিহাস হলো হাজার বছরের ইতিহাস। মহেশখালি দ্বীপে হাজার বছর আগেও মানুষের বসবাস ছিল। এ প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন, "ইহার (মহেশখালি) ঘাটের নাম ছিল 'গোরক্ষনাথের ঘাট'-অপভ্রংশে 'গোরকঘাটা'। মহেশখালি একদা নাথ ধর্মের প্রান্ত স্পর্শ করিয়া থাকিবে। নহিলে ইহার নাম শিবের নামে হয় কি করিয়া। ইহাতেই প্রমাণ হাজার বছর আগেও এ দ্বীপে মানুষের বসবাস ছিল।"[৮]

রাবণের লঙ্কা ও রামায়ণী যুগে চট্টগ্রামের মৈনাকের কথা উল্লেখ আছে। "তন্ত্রে উল্লেখিত আছে রাবণ রাজা কৈলাস হতে মহাদেবকে নিজ দেশে নেবার সময় মহেশখালীতে রেখে যান। ইহা আদিনাথ শিবরূপে পূজিত হয়। বাগচীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায়ও উল্লেখিত আছে 'আদিনাথ শিব মৈনাক পর্বতে মহেশখালী' চট্টগ্রাম। সন্ন্যাসী মহলে মৈনাক পর্বতস্থ আদিনাথ শিবের বিশেষ সমাদর দেখা যায়।

শোভিছে তাহার গিরি সমুদ্র ভিতর।
শোভিছে তাহার শৃঙ্গ অতি মনোহর।।
এথায় শিবের বাস ইচ্ছা হল মনে।
চাপিল রাবণে বাম অঙ্গুলি চালান।।
তদবধি আদিনাথ রহিল তথায়।
ভারত প্রসিদ্ধ দেব নিজ মহিমায়।। ইত্যাদি।
শ্রী শ্রী চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ"[৯]

চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র তত্ত্বনীধি উল্লেখ করেন, মৈনাক হলো হিমালয়ের শাখা। হিমালয়ের এক শাখা আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম হয়ে ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত, যা চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ মহেশখালি দ্বীপে একটি শাখা উঠেছে। আর এটা লোনা সমুদ্রস্থিত মৈনাক পর্বত। মহেশখালীর এ মৈনাক পর্বতেই আদিনাথ শিব চিরপ্রসিদ্ধ। "*শীর্ষে নিত্যং নিদায় ত্রিপুরহর মহো আদিনাথং মহেশং। মৈনকো যত্র শৈলো বসতি হিমগিরে রঙ্গজঃ সীন্দুতীরে।*" বর্তমানে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হলো মৈনাক বা আদিনাথ। অনেকেই অনুমান করেন যে, বর্তমান নিম্নবঙ্গ যখন বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল তখন এ পূর্ব সাগরস্থ মৈনাক (মহেশখালীর আয়তন ভেঙে গিয়ে মৈনাক [পর্বত অংশ] ক্ষুদ্রাবস্থায় আছে) মহেশখালীর ওপর দিয়ে পূর্ব সাগরতীরস্থ উপরোক্ত পূর্ব দেশাদিতে যাতায়াত করত। হনুমান ও সেরূপ, পশ্চিম দেশ হতে প্রথমত এ মৈনাকে উপস্থিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি রচিত আদি মহাকাব্য *রামায়ণের* (বাল্মীকি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রামায়ণ রচনা করেন) সুন্দরকাণ্ড ১ম পর্বের ৮৭ ও ৯৬ নং শ্লোকে কবি উল্লেখ করেছেন:

তস্মিন প্লবগশার্দ্দুলে প্লাবমানে হনূমতি।
ইক্ষাকুকুল মানার্থী চিন্তায়মাস সাগরঃ।।
হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবনাম্বসঃ।
উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ।।[১০]

মহাকবি কালিদাস রচিত *কুমার সম্ভব*-এর প্রথম অধ্যায়ে মৈনাক পর্বতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ মৈনাক পর্বত হলো মহেশখালি দ্বীপ। মহাকবি কালিদাস ও বাল্মীকির লেখা থেকে বলা যায় মহেশখালি দ্বীপে জনবসতি বা মানববসতি বহু বছর আগে থেকে ছিল। কালিদাস শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁর নিজ নামই কালিদাস। অনেকে মনে করেন, কবি কালিদাস প্রাগজ্যোতিষপুর (কামরূপ)-বাসী ছিলেন। কালিদাস তাঁর কাব্যগ্রন্থে সুক্ষদেশ, মৈনাক পর্বত, রামগিরি, দেবগিরি ও চর্মন্বতী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।[১১] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ *ইসলামাবাদ* গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের বিবরণ দেন: "পৃথিবীর চারিটী মহাধর্মশক্তি এখানে এসে মিলিত হয়েছে। ইহা হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ এই তিন মহাজাতির একটা পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। সীতাকুণ্ড তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। শিব চতুর্দশীর সময় এতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দু পুরাণের নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। এই শহরের উত্তরাংশে হিন্দু পুরাণের চট্টেশ্বরী পীঠ বর্তমান। মহেশখালী দ্বীপের আদিনাথও হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থ।"[১২] সুণীতিভূষণ কানুনগো নাথ ধর্ম সম্পর্কে লেখেন, "নাথ ধর্মের প্রবর্তক হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীন নাথ। পি. সি. বাগচী লিখেছেন, "Nathism orignated from the religion of the siddhacharyas as its reputed founder was Matsyendranath' or Mira nath." মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথ শিবের কাছে যোগাভ্যাস শিক্ষা করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথের খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত ছিল। গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট থেকে যোগ সাধনা শিক্ষা করেন

এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন। গোরক্ষনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাথ ধর্ম প্রচার করেন। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা এবং মহেশখালী দ্বীপের গোরকঘাটা গ্রাম তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।"[১৩] মহেশখালির আদিনাথ মন্দিরের কাছে বর্তমান গোরকঘাটা। গোরকঘাটা বা গোরখঘাটা নামটি গোরক্ষনাথ থেকে উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। "গোরক্ষনাথের কোনো শিষ্য তাঁর গুরুর নামে মহেশখালীর 'গোরক্ষঘাটা' নামকরণ করতে পারেন।"[১৪] মহেশখালীর আদিনাথ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, "রাবণ রাজা তপস্যা করিয়া মহাদেশকে স্বদেশ নিবার সময়ে তাঁহার প্রস্রাবের পীড়া হওয়ায় পথিমধ্যে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া মৈনাক পর্বতে প্রস্রাব করিতে বসেন, পরে প্রস্রাব করিয়া আসিয়া আর তাঁহাকে উঠাইতে না পারিয়া বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশ ফিরিয়া যান। মুত্রখালী নামক একটি ক্ষুদ্র ছড়াও তথায় বিদ্যমান আছে।"[১৫] পরবর্তীকালে এই মুত্রখালী পরিবর্তিত হয়ে 'মুতের ছড়া' বা 'মুতাছাড়া' নামে মহেশখালিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য লোককাহিনি হলো স্থানীয় জমিদার নুর মোহাম্মদ সিকদার ও তাঁর একটি দুগ্ধবতী গাভিকে নিয়ে। "নুর মোহাম্মদ সিকদার বর্তমান ছোট মহেশখালীর বাসিন্দা। গাভীটি কোনভাবেই তাঁর বাড়িতে দুধ দিত না। গাভী বাড়িতে দুধ না দেয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখেন যে, গাভীটি প্রতিদিন পাহাড়ে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট পাথরে বা শিলা খণ্ডের উপর দাঁড়ালে তার ওলান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুধ গড়িয়ে পড়ে পাথরটিকে ভিজিয়ে দেয়। কিন্তু নুর মোহাম্মদ সিকদার গাভীটিকে দুধের আশায় রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। পরের ঘটনা অন্যরকমভাবে দেখা যায়। রশি ছিঁড়ে গাভীটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পাথরটিকে দুধ দিয়ে ভিজিয়ে দিতে থাকে। একদিন তাঁর গাভীটি হারিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর গাভীটিকে নির্দিষ্ট শিলা বা পাথরের পাশে পাওয়া যায়। সিকদার সাহেব গাভী ও শিলাটিসহ বাড়ি নিয়ে যান। তিনি শিলাটি ঘরে নিয়ে যান। রশি দিয়ে গাভীটি বেঁধে রাখেন। রাতে কিসের আওয়াজে যেন সিকদার সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন যে, গাভীটি শিলার উপর দুধ ঢালছে। তাঁর মনে সন্দেহ হল। রাতে সিকদার সাহেব স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁকে একজন সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নচেৎ তিনি স্ববংশে বিনাশ হবেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে সিকদার সাহেব একশ জমি দান করে এবং কাঁচা ঘরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। সিকদার সাহেব কিছুদিন পর আবারো স্বপ্ন দেখেন যে, আদিনাথের পাশে অষ্টভূজার মন্দির স্থাপন করতে হবে। শিবের শক্তি অষ্টভূজা মূর্তিটি নেপাল থেকে আনতে হবে। এক নাগা সন্ন্যাসীর সহায়তায় নেপাল থেকে পাথরের অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তি আনয়ন করে আদিনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মহেশখালীর নুর মোহাম্মদ সিকদার ও রামুর জমিদার প্রভাবতী রাণী এবং নেপালের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[১৬]

মহেশখালি নামকরণ সম্পর্কে আরেকটি প্রস্তাবণা আছে যে, "শিবের অপর নাম গণেশ ও মহেষ। 'শিব'-এর অপর নাম 'মহেষ'-এর নামানুসারে মহেশখালী নামকরণ। ইষ্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানীর রেকর্ড পত্রে দ্বীপের নাম লিখা হয়েছে মুইশখাল (Moiscal)। আবার অনেকে মনে করেন স্থানীয়ভাবে 'মহিশ'-কে মুইশ বলা হয়। এক সময় দ্বীপের বনাঞ্চলে প্রচুর 'বন্য মুইশ' থাকত। সে কারণে দ্বীপের নামকরণ 'মুইশখালী' হয়েছে। 'মুইশখালী' আধুনিক হয়ে মহেষখালী বা মহেশখালী হয়েছে।"[১৭] "মহেশখালীর আদি নাম ছিল আদিনাথ-মহেশখালী।"[১৮] আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে সুণীতিভূষণ কানুনগো *A History of Chittagong* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> The Second Important Center of Saivism in the District is the Shrine of Adinath, Situated in the Island of Moheskhali. The Origin of the Name of Adinath Can be Examined in The Tantrick Work. Dr. Muhammad Shahidullah is not far from the truth to say that the Adibudha of the Buddhist Tantrik works was transformed into Adinath (Adi-first, the first of the Nathas) in the Natha cult. Adinath may also be identified with adideva or Mohadideva of the Tantras. In Mohanirvanatuntra Adinath is sated as the first gur.[১৯]

একসময় কক্সবাজারের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে মহেশখালী যুক্ত ছিল।[২০] সুণীতিভূষণ কানুনগো বলেন, "মহেশখালী পূর্বে কক্সবাজার জেলার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল। ১৫৬৯ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু জলোচ্ছাসের ফলে এই অংশটা মূল ভূ-খণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে ঐ জলোচ্ছ্বাসে বা সুনামিতে কতজন মানুষ মারা গেছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মহেশখালী দ্বীপটি সেই সুনামির ফলে সৃষ্ট বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। সিজার ফ্রেডরিখ সে সময় সন্দ্বীপে ছিলেন। আর সে কারণে ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক ও লেখকরা 'মহেশখালী' কে 'গবীধষ' দ্বীপ বর্ণনা করেছেন। এই গবীধষ শব্দটা ক্রমান্বয়ে Mosical বা Mohes Island বা Moheshkhali Island হয়েছে।"[২১] মহেশখালি দ্বীপটি পাহাড় আর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এর চ্যানেল আর সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল ছিল জলদস্যুর ঘাঁটি। চট্টগ্রাম থেকে রেঙ্গুন আকিয়াবে যাতায়াতকারীসহ এই দিক দিয়ে জলপথ ব্যবহারকারীদের সর্বস্ব লুটে নিত এসব জলদস্যু।"[২২] মহেশখালী দ্বীপ হলেও সেখানে রয়েছে টিলা, পাহাড় বা উঁচু ভূমির সমন্বয়।[২৩] চট্টগ্রামের ইতিহাসে আরাকানি আমল ১৫৮০-১৬৬৫ খ্রি. পর্যন্ত। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পরবর্তীকালে উত্তর চট্টগ্রামও আরাকান রাজ্যভুক্ত হয় এবং ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি পঁচাশি বছর আরাকানের সাতজন রাজা একাদিক্রমে সমগ্র চট্টগ্রাম শাসন করেন।[২৪] "১৫৮০ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানী শাসন শুরু হলে মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে মহেশখালী দ্বীপাঞ্চলের উপর সরকারের প্রত্যক্ষ কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলশ্রুতিতে উক্ত দীপাঞ্চলে গড়ে উঠেনি সুশৃঙ্খল কোন জাতির আবাস। এখানে গড়ে উঠতে থাকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও মঙ্গোলীয় জলদস্যুদের আবাস। ফলে ঐ সময় বারবার আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠিত হয়েছে।"[২৫] ১৭৬২ সালে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প

হয়েছিল বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায়। এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই।[২৬] উল্লেখ্য, "১৭৯৩ এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে ভীষণ তুফান হয়। মাটির গুদাম মাটিতে মিশে যায়। পূর্ণচন্দ্র দেব বলেন, চট্টগ্রামের কাছারীর কিছু অংশ নষ্ট হয়েছিল। তুফানের পরে এল আকাল। কিছুদিন চাউলের দাম ছয় হতে আট সের পর্যন্ত হল। দক্ষিণ চট্টগ্রাম বিশেষ করে কক্সবাজার ও মহেশখালী সম্পূর্ণ ডুবে গেছিল। গরু ও মানুষের লাশ ভেসে ভেসে আসছিল দলে দলে।"[২৭]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ *ইসলামাবাদ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "দক্ষিণে শঙ্খ ও মাতামুহুরী আর কর্ণফুলী নদী পূর্বাশার দিগন্তস্থিত পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম মুখে গিয়ে অনন্ত বিস্তার বঙ্গোপসাগরের বারিরাশির সাথে কোলাকুলি করছে। এই নদী তিনটিই চট্টগ্রামের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে সরসতা ও সজীবতা প্রদান করে ইহাকে শস্য শ্যামল ও সজল করে রেখেছে। বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে মহেশখালী, কুতুবদিয়া প্রভৃতি দ্বীপের উদ্ভব হতে আমাদের জন্মভূমি কেবল সসাগরা নয়, সদ্বীপা আখ্যা ধারণেরও অধিকারিণী।"[২৮] ইতিহাসবিদ আবদুল করিম উল্লেখ করেন,

> তুরস্কের সুলতান সুলায়মানের লোহিত সাগর নৌবহরের ক্যাপ্টেন ছিলেন সিদি আলী রইছ বা সিদি আলী চেহলভী। তিনি *মিরাৎ-উল-মমলিক* গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় উপকূল থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত দেশের বিবরণ দিয়েছেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মুহীত (বা মহাসাগর) নামে আরেকটি বই লেখেন। তিনি এ বইয়ে চট্টগ্রামের উপকূলে নৌপথের বিবরণ দেন। তিনি এ গ্রন্থে যে সকল স্থানের নামকরণ করেছেন, সেগুলি হলো-দরদিউ, ফেশত হাই ডমিউন, বাকাল, কাকরদিয়া, জেঞ্জিলিয়া এবং ফেশত গোরীয়ান। তিনি দরপিউকে নারকেল দ্বীপ/সেন্টমার্টিন, বাকালকে মোসকাল বা মইশখালী বা বর্তমান মহেশখালী দ্বীপের সঙ্গে এবং কাকরদিয়াকে কুতুবদ্বীপ বা কুতুবদিয়া বুঝিয়েছেন। সিদি আলী চেহলভী দরদিউর পরে বাকালের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাকাল একটি খাড়ী বা প্রণালী। হেমর বাকালকে মোসকাল বর্তমানে মহেশখালী রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই খাড়ীই কক্সবাজার মহেশখালীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। পরে বাকাখল বা বাঁকখালী নামে পরিচিত হয়।[২৯]

আবদুল করিম আরও উল্লেখ করেছেন, "ডি. বেরসের মানচিত্রে 'বাকালো'একটি দ্বীপ আছে। কিন্তু ডি. বেরসের বাকালো দ্বীপে চট্টগ্রামের দক্ষিণে ভূ-খণ্ডকে চকরিয়া দ্বীপ নামে অভিহিত করেন। বর্তমানে চকরিয়া নামে দ্বীপ নেই। আধুনিক দ্বীপগুলি মইশখালী বা মহেশখালী এবং কুতুবদিয়া, মহেশখালীর নিকটবর্তী মাতারবাড়ি ও সোনা নামে ছোট দ্বীপও আছে। এই দ্বীপগুলির নাম ডি. বেরসের মানচিত্রে নেই। বেরসের মানচিত্রে চকরিয়া দ্বীপের পাশে উপকূলভাবে মাছু নামে একটি স্থান চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে মাছু স্থানটি দ্বীপে পরিণত হয়ে মাছু খাল বা মাছুখালী, মাছুখালী থেকে মইশখাল বা মইশখালী এবং বর্তমানে মহেশখালী নাম হয়েছে।"[৩০] অনেকে মনে করেন, এই মইশখালী থেকে বর্তমানে

মহেশখালী। চকরিয়ার উত্তরে অবস্থিত বাঁশখালীর ছনুয়াখালী এবং দক্ষিণে ফুলছড়ি এছাড়া পূর্বে লামা এবং পশ্চিমে মহেশখালী-কুতুবদিয়া প্রণালী বহমান।[৩১]

মাহবুব-উল আলম মহেশখালির উপনিবেশিক আমলের ইতিহাসের বর্ণনা করেন নিম্নরূপে:

> কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী রবার্ট ওয়ারলেজ (পরে চট্টগ্রামের সল্ট এজেন্ট) ১৭৭৯ সালের ৫ই জুন মহিষখালী দ্বীপের বন্দোবস্তির প্রার্থনা করেন। তিনি দ্বীপটি আবাদ করে মগদিগের আক্রমণ হতে ইহাকে রক্ষা করার জন্য কতগুলি মাটির কেল্লা নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। বোর্ড অব রেভিনিউ ঐ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইহার দলিল সম্পাদন হয় ১৭৮২ সালে। কিন্তু ঐ সালের ২০ই নভেম্বর ওয়ারলেজ মহিষখালী চার্লেস ক্রফটেসের নিকট ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। ক্রফটস তখন চট্টগ্রামের কালেক্টর। তিনি ৪০ হাজার টাকায় কালীচরণ কানুনগোর নিকট ইহা হস্তান্তর করেন। কালীচরণ তখন চট্টগ্রামের দেওয়ান। ১৭৯০ সালে কালীচরণের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী প্রভাবতী মহিষখালীর মালিক হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রভাবতীর নামেই তরফবন্দী হয়। প্রভাবতী নিঃসন্তান ছিলেন, জনৈক চণ্ডীচরণকে পোষ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভাবতীর জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্র নামক এক পুত্র রেখে ১৮২০ সালে তিনি মারা যান। প্রভাবতীর মৃত্যু হয় ১৮২৬ সালে। তখন শরৎচন্দ্র নাবালেগ বিধায় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক শাসিত হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্র মহেশখালীর জমিদার হন। ১৮৩৯ সালের এক রিপোর্টে মহিষখালীর মোট জমির পরিমাণ ৪০৬৫ দ্রোন এবং রাজস্ব ৮,৪৮২ টাকা দেখা যায়।[৩২]

এইচ. জে. এস. কটন তাঁর *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> The grant of the Island of Moiscal to Mr. Robert Warlledge is signed by Warren Hastings Edward Wheler. A copy of the original is filed with Mr. Collector Pattensons letter dated 21st august 1815. The grant was fair on the 25th July 1780, but was not signed and delivered till 1782. It was drawn out by Mr. Tolfery, the companys Attorney, according to full legal Phraseology, but by an oversight the date of execution is omitted in the body of the deed. The indenture is between the united company Merchants of England trading to East India on the one part, and Robert Warlledge of Chittagong in the province of Bengal gentleman on the other part.[৩৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা ফ্রান্সিস বুকানন-হ্যামিল্টন ১৭৯৮ সালে কোম্পানির বোর্ড অব ট্রেডের নির্দেশক্রমে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা ভ্রমণ করেন। তিনি ১৭৯৮ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত মোট চারদিন মহেশখালীতে অবস্থান করেছিলেন।

বুকানন এ চারদিনে মহেশখালির বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি গোরকঘাটা, বড় মহেশখালি, হোয়ানকের পানির ছড়া, রাখাইন এলাকা, হিন্দু মন্দির বা আদিনাথ মন্দির, পাহাড়ি ঝরনা বা মুইত্তাতলীর ছড়া এবং আরও বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা ভ্রমণ করেছেন। ফ্রান্সিস বুকানন এ সময় বাঘের পদচিহ্ন লক্ষ করেছেন। মহেশখালির পাহাড়ে এ ধরনের হিংস্র প্রাণী ও বন্য শূকর প্রচুর আছে এবং দ্বীপে বন্য হস্তী পাওয়া যেত।[৩৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> On account of the strong winds, having failed in all my attempts to procure a boat, willing to go to the Naaf, I this morning set out for Mascal Island. I landed at a Rakain village on the Sea shore, near a monoument erected to the memory of Mr. Hurris, formerly commercial resident at Chittagong. Ifound my tents pitched on a piece of ground, which serves for a market place, called Adeegunge, named Gooroobatta. Here also I failed in an attempt to procure a boat willing to go to the Naaf, and I determined to go to Ramoo by the way of Rajoo river and Rutnapallung. To the last-mentioned place, I therefore sent people by the way of Ramoo, carry a supply of provisions, which Rutnapallung does not afford. In the evening I walked out through the plain to the west ward, which is Barah Mascally.[৩৫]

এ প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন, "বুকানন মহেশখালি দ্বীপের দক্ষিণ দিকের এক জায়গায় বনের যুবরাজ বাঘের আনাগোনা আছে এমন প্রমাণ পেয়েছিলেন।"[৩৬] "ইংরেজ সরকার কক্সবাজারকে মহাকুমায় উন্নীত করে ১৮৫৪ সালের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায়। ৭টি থানার সমন্বয়ে কক্সবাজার মহাকুমা গঠিত হয়; যথা: চকরিয়া, কক্সবাজার, রামু, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, উখিয়া ও টেকনাফ। ১৯৮৫ সালে প্রশাসনিক বিন্যাসে চট্টগ্রাম জেলা থেকে কক্সবাজার মহাকুমার ৭টি থানা পৃথক করে কক্সবাজার জেলার সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৩৭] ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। আর "পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫০ সালে নূরুল আমীন সরকার কর্তৃক জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীযুক্ত অজিত কুমার রায় মহেশখালীর সর্বশেষ জমিদার ছিলেন।"[৩৮] "মহেশখালীর সর্বশেষ জমিদার অজিত কুমার রায়ের মূল বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার পরৈকোড়া গ্রামে। সেই সময়ে বৃহত্তর আনোয়ারা, পটিয়া ইত্যাদি ছিল প্রখ্যাত দেয়াঙ্গ রাজ্য। অনেকে মনে করেন, মহেশখালীর বেশিরভাগ মানুষ এসেছে দেয়াঙ্গ থেকে। দেয়াঙ্গ পাড়া বা দেবাঙ্গ পাড়া নামে একটা পাড়াও আছে এখন মহেশখালীতে।"[৩৯]

বঙ্গোপসাগরের মহেশখালি চ্যানেল, বাঁকখালী, মাতামুহুরি আর কোহেলিয়া নদীর পানি লবণাক্ত। তা দিয়ে বছরে ছয় মাস চলে লবণ উৎপাদন আর বাকি ছয় মাস হয় মাছ-কাঁকড়ার চাষ। মহেশখালির মিষ্টি পান পৃথিবীখ্যাত।[৪০] মানচিত্রে মহেশখালি ছোট্ট দ্বীপ

হলেও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী বহুদা বিভক্ত।[৪১] মহেশখালি চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে গঠিত ও অবস্থিত। পৃথিবীতে এমন দ্বীপমালা বিরল। মহেশখালী আয়তনের দিক থেকে সিঙ্গাপুর, হংকং ও মালদ্বীপের প্রায় কাছাকাছি। এ দ্বীপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারপাশে সমুদ্র জলরাশি, দ্বীপগুলি যেন ভাসমান বিশাল এক জাহাজবহর আর উত্তর-দক্ষিণ লম্বা তাঁর উঁচু পর্বতমালা মনে হয় যেন বহরের সুউচ্চ পাল। কাছ থেকে আর দূর থেকে দেখুন না কেন সমুদ্র ঘেঁষে উঁচু পাহাড় যে-কোনো প্রকৃতিপ্রেমী ও নান্দনিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে অনায়াসে আকৃষ্ট করে।[৪২] দ্বীপের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে উত্তর-দক্ষিণমুখী পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে প্রবাহিত মহেশখালী চ্যানেল দ্বারা মূল ভূ-খণ্ড থেকে আলাদা এ দ্বীপ।[৪৩] প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৫৬৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে কক্সবাজার জেলার ওপর আঘাত হানে। এ কারণে প্রভূত জানমালের সাথে মূল ভূ-খণ্ডের অনেক উলটপালট হয়ে যায়। এর পরে ১৭৬২ সালে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প, ১৭৯৫ সালের ৩ জুন ব্যাপক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিবায়ু, ১৭৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এক প্রচণ্ড হারিকেন, ১৮৭৬ সালে ৩১ অক্টোবর ভয়ঙ্কর টর্নেডো বয়ে যায়। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে টর্নেডো, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ১৯৫৮ সালে মে মাসে সাইক্লোন, ১৯৬০ সালের ৯ অক্টোবর প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে এ জেলায়। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে টানা বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি ঢল প্লাবিত হয়।[৪৪] এর ফলে ঘরবাড়ি, জানমাল, পশুপাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ছাড়া হাজার হাজার মানুষও মারা যায়। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এই জেলার ওপর আঘাত হানে শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এ তুফানে কক্সবাজার জেলার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মারা যায়। সেই ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে মহেশখালিতে এবং সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয় মহেশখালীতেই।[৪৫]

উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, তুফান, বন্যা ও ভূমিকম্প মহেশখালিতে নিত্যসঙ্গী। বহু বছর আগে যেরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হতো, আধুনিক কালেও মহেশখালীতে নানা দুর্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহেশখালির ইতিহাস কক্সবাজারের ইতিহাস তথা চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। চট্টগ্রামের ইতিহাসের ভিতরেই কক্সবাজারের ইতিহাস তথা মহেশখালীর ইতিহাস বিদ্যমান। সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান (পূর্বনাম রাখাইন) পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের উপকূলীয় ভূ-ভাগ ভূ-কম্পনজনিত কারণে এক বিরাট পরিবর্তনের শিকার হয়েছে।

আবদুল করিম চট্টগ্রাম-আরাকানের প্রসঙ্গে লেখেন, "ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মিনথি'র শাসনামলে বঙ্গদেশ থেকে এক নৌ হামলার প্রমাণ পাওয়া গেছে, আরাকান থেকে একাধিক হামলার আস্বাদ গ্রহণ করতে হয় চট্টগ্রামকে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগে চট্টগ্রাম মাঝে মধ্যেই

আরাকান রাজাদের কব্জায় ছিল।"[৪৬] "বাংলাদেশে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঠান রাজত্বের অবসান হলেও কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি বিহীন চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্ন আফগান শাসন ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি পাঁচ বছরকাল বহাল ছিল। চট্টগ্রামের আফগান শাসক জামাল খাঁন পন্নী ত্রিপুরা ও আরাকানের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই পাঁচ বছর চট্টগ্রাম শাসন করেন। অতঃপর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকানের রাজাদের অধিকারে চলে যায়। তখন থেকে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ অবধি পঁচাশি বছরকাল চট্টগ্রাম একাদিক্রমে আরাকান রাজাদের শাসনাধীনে ছিল।"[৪৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে আরাকান রাজা মেঙ ফেলাউঙ বা সেকেন্দর শাহ চট্টগ্রাম জয় করেন। চট্টগ্রাম এলাকাটি বাংলার সুলতান, ত্রিপুরা এবং আরাকান রাজ এই রাজ্যত্রয়ের রাজ্যলিপ্সা সন্তুষ্টির একটি ক্ষেত্র বিশেষ।"[৪৮] "আদিনাথ প্রতিষ্ঠিত পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একেবারে পাশেই বঙ্গোপসাগর। তার উন্মাতাল সুবিধার জন্য জনপথের পুরানো ঘাটটি এখন দীর্ঘ সুদৃশ্য ও সুগঠিত আকারমণ্ডিত একটি সেতুদৃশ্য।"[৪৯] মহেশখালি আদিনাথ মন্দির বহু স্মৃতিবিজড়িত। এ আদিনাথ মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। বছরের নির্দিষ্ট সময় এ আদিনাথে মেলা হয়। দেশবিদেশ থেকে বহু পর্যটক এ মেলায় আগমন করেন। হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয় এ মেলায়। মহেশখালি থেকে শুরু করে কক্সবাজার ও রামু হয়ে একটি পাহাড়ি ধারা (রেঞ্জ) টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫০] L. S. O. Malley তাঁর *Eastern Bengal District Gazetters Chittagong* গ্রন্থে বলেন,

> Maiskhal Island in the Coxsbazar subdivision, situated off the coast between $21^0$29' and $21^0$49' N, and between $01^0$50' and $91^0$58' E. It has an area of 102 square miles, being 60 to 70 miles long and 7 to 8 miles broad, its populations, according to the census of 1901 is 24,228 souls. Through the centre of the Island and along the eastern coast lines rises a range, of low hills 300 feet high, but the coast to the west and north is a low-lying treat, fringed by mangrove jungle, which in its general charteristics resembles to a permanently settled estate. Maiskhsl village is the headquarters of a police circle axtending over 138 square miles, and in the hills, on the coast, opposite the Baghkhali River, is built the Shrine of Adinath dedicated to Siva. This shrine, which attracts pilgrims from all parts of the district, is controlled by the Mahanth of the Sambhuuth Shrine at Sitakund. By its side on the same hill is a Buddhist pagoda.[৫১]

১৬৬৬ সালে মোগল সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকা আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান রাজ্যের শক্তিশালী নৌশক্তি থাকার কারণে বঙ্গোপসাগরে রাখাইনদের অবাধ বিচরণ ছিল। সে কারণে মহেশখালী দ্বীপও রাখাইনদের নিকট খুবই পরিচিত ছিল। এ দ্বীপে সে সময় থেকে রাখাইনদের অবাধ বিচরণ ছিল ও অস্থায়ী বসতি ছিল।"[৫২]

আদিনাথ পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করা যায়। এ পাহাড়ের দৃশ্য দেখে লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের সৃজনশীল চিন্তা বিকশিত হয়। কবি নিলয় রফিক তাঁর 'আদিনাথের আলো' কবিতায় যেমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

অদূরে রজনী গন্ধ শোভা কারু ফুল
লাজুক সুরভি রাত্রি বোধ কাব্যকথা
অমৃত আকাশে তারা-ভরা পাঠশালা
পিপাসার পরমায়ু আদিনাথের সূর্য।[৫৩]

কালের বিবর্তনে মৈনাক পর্বত বা আদিনাথ-মহেশখালি এখন মহেশখালি হিসেবে পরিচিত। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনাময় আগামীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে মহেশখালি। মহেশখালি মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সৌরশক্তি কেন্দ্র, প্রাকৃতিক গ্যাসের এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ হচ্ছে। মহেশখালির জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দ্বীপে জমি আছে ৮৬ হাজার একর। ইতোমধ্যে বেজার অধিগৃহিত জমিই প্রায় তিন গুণ বেড়ে ২৭ হাজার একর হয়েছে। মহেশখালীর প্রকল্পগুলোতে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, কুয়েত, থাইল্যান্ড, জাপান থেকে বিনিয়োগ আসছে।[৫৪] মহেশখালীতে রয়েছে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অনন্য সুন্দর দ্বীপ সোনাদিয়া। সোনাদিয়া দ্বীপ জেলা শহরের ৯ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরে। আর এ দ্বীপে বিশাল প্যারাবন ও শুঁটকির আড়ত রয়েছে। মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপে আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। মহেশখালি দ্বীপে দেশি-বিদেশি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার সোনাদিয়া দ্বীপে অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে ইকো ট্যুরিজম পার্ক তৈরি করছে। এ দ্বীপ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সমুদ্রের পানিতে সামুদ্রিক মাছ ও লোনা পানিতে প্যারাবনের সৌন্দর্য বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির সমাগম দেখা যায় এখানে। বলা যায়, সনাতন মহেশখালির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখন মহেশখালী দ্বীপে সমুদ্রবন্দর, ইকো ট্যুরিজম পার্ক, বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ প্রকল্প ও গ্যাস টার্মিনাল হচ্ছে। এ-সকল উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, পরিবেশের ভারসাম্য এবং স্থানীয় জনগণের বাঁচার অধিকারও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্যতম জেলা হলো কক্সবাজার। আর কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। প্রতি বছর বহু পর্যটক এ সৈকতে বেড়াতে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন মাতারবাড়ি ও সোনাদিয়ায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী। কারণ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সমুদ্রবন্দরের উপযোগী স্থান এ মহেশখালি। "তবে বেশ কয়েকজন পরিবেশবিদ আশঙ্কা করছেন, শিল্পোদ্যোগগুলো ভাঙ্গন প্রবণ এ দ্বীপের নাজুক প্রভাব পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতি করতে পারে। মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন-সহ কক্সবাজার উপকূলের দ্বীপগুলো অনেক জলচর বা উভচর প্রাণী ও পাখির আবাস কেন্দ্র। আছে চার-পাঁচ প্রজাতির ডলফিন আর বিপন্ন দুই প্রজাতির কাছিম।"[৫৫] কক্সবাজার জেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন দ্বীপ। "এটি মহেশখালী দ্বীপের একটি সম্প্রসারিত অংশ। তবে এর মধ্যে বিপুল পরিমাণ প্রবাল ও সামুদ্রিক ঘাস এসে জমা হয়েছে। পৃথিবীর খুব কম দ্বীপে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে সামুদ্রিক ঘাস ঘন সেখানে নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ থাকে। নানা ধরনের রঙিন মাছ ও ঘোড়ামুখো ঘোড়ামাছ এ দ্বীপে আছে। পর্যটনের জন্য দ্বীপটি খুবই উৎকৃষ্ট।"[৫৬] মহেশখালি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের একটি নান্দনিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি দ্বীপ। এ দ্বীপের কৃষি সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, লবণ শিল্প, শুঁটকি মাছের আড়ত ও মিষ্টি পানের বরজসহ আরও প্রাকৃতিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য। একসময় মহেশখালী পাহাড়ে বাঘ, হরিণ ও নানা হিংস্র পশুর উপস্থিতি ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে পাহাড়, বন ও গাছপালা কেটে উজাড় করা হচ্ছে। আর সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ দ্বীপকে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু পূর্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ভারসাম্য কতটুকু রক্ষা করা যাবে? এক কথায় বলা যায়, "মহেশখালি দ্বীপটি মনুষ্য সন্তানের বাসভূমি পরিচয় অদূর ভবিষ্যতে বিলীন হতে চলেছে। কয়লার কারখানায়, তেলের বিপণী বা শিল্প নগরীতে মানুষ থাকবে কতটা আর কতটা থাকবে না তা সংশয়ের বিষয়।" কক্সবাজার জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো মহেশখালি। মাতারবাড়িতে বিদ্যুৎ প্রকল্প, সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর অথবা ইকো ট্যুরিজম পার্ক এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মহেশখালি দ্বীপে নির্মাণ হচ্ছে। তবে পাহাড়ি অঞ্চল ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মহেশখালি দ্বীপ ইতিহাসে এক অনন্য স্থান হিসেবে পরিচিত।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. সলিমুল্লাহ খান, 'ভূমিকা: বিষণ্ন মহেশখালি', সাদাত উল্লাহ খান ও শাওয়াল খান (সম্পাদিত), *মহেশখালি: উন্নয়ন, নীতি ও নিয়তি*, (ঢাকা: প্রতিবুদ্ধিজীবী, মার্চ ২০১৯), ১১-১৭।

২. আবদুল করিম, 'ইতিহাস', *কক্সবাজারের ইতিহাস*, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ৩০ জুন ১৯৯০, ৭-৬৩।

৩. শাওয়াল খান, 'আমি সোনাবন, দ্বীপের শেকড়, দ্বীপের প্রাণ, আমাকে বাঁচান', আলোকিত বাংলাদেশ, ২৫ এপ্রিল ২০১৮।

৪. সাদাত উল্লাহ খান ও শাওয়াল খান (সম্পাদিত), *মহেশখালি: উন্নয়ন, নীতি ও নিয়তি*, (ঢাকা: প্রতিবুদ্ধিজীবী, মার্চ ২০১৯), ২৩।

৫. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনীধি, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (অখণ্ড)*, (ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুলাই ২০১১), ৮৭।

৬. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, জুন ২০১৮), ২৩৯।

৭. সুণীতিভূষণ কানুনগো, *চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বাতিঘর, এপ্রিল ২০১৯), ৪৪।

৮. সলিমুল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*, ১৪-১৫।

৯. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনীধি, *প্রাগুক্ত*, ২০৬।

১০. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনীধি, *প্রাগুক্ত*, ২১০-২১১।

১১. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনীধি, চট্টগ্রামের ইতিহাস (অখণ্ড), *প্রাগুক্ত*, ১৬৪-১৬৫।

১২. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ইসলামাবাদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), ২১-২২।

১৩. সুণীতিভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, ৪৪-৪৫।

১৪. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরের ইতিকথা (চট্টগ্রাম: বলাকা, ২০১১), ২৫।

১৫. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্ববনীধি, *প্রাগুক্ত*, ৮৭।

১৬. অধ্যাপক নুর আহমদ, *কক্সবাজারের ইতিহাস*, মে ১৯৮৮, ২২২-২২৭। বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত, ২২-২৪।

১৭. মুহম্মদ নুরুল ইসলাম, 'পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ', *কক্সবাজারের ইতিহাস*, ক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ৩০ জুন ১৯৯০, ২৮৯-২৯০।

১৮. সলিমুল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*, ১৪।

১৯. Suniti Bhushen Qanungo, *A History of Chiittagong,Vol. 1* (Chittagong, 1988), 101-102.

২০. সাদাত উল্লাহ খান ও শাওয়াল খান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ৫৯।

২১. Suniti Bhushen Qanungo, *A History of Chittagong,* 92

২২. মোহাম্মদ আজিজুল করিম ও খালেদ মাহবুব মোর্শেদ, 'মহেশখালীর শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষাবৃতীর কথা', *সোপান*, এসএসসি বিদায়ী স্মারক ২০১৬, সংখ্যা-৯, মহেশখালী আইল্যান্ড হাইস্কুল, ২৪ জানুয়ারি ২০১৬, ১৭।

২৩. মুহম্মদ নুরুল ইসলাম, *কক্সবাজারের মুক্তিযুদ্ধ*, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৩।

২৪. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রাম-আরাকান*, (চট্টগ্রাম: কথামালা প্রকাশনা, জুন ১৯৮৯), ১০৮।

২৫. আবদুল হালিম মিয়া (গ্রন্থনা), 'স্থানীয় সরকার', *কক্সবাজারের ইতিহাস*, (কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ৩০ জুন ১৯৯০), ৩৫৯-৩৬০।

২৬. এন. এম. হাবীব উল্লাহ, 'ভৌগোলিক অবস্থান', *কক্সবাজারের ইতিহাস* (কক্সবাজার: কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ৩০ জুন ১৯৯০), ০৫।

২৭. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল)* (চট্টগ্রাম: আলমবাগ প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮২), ৫৭।

২৮. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *প্রাগুক্ত*, ১৫।

২৯. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *প্রাগুক্ত*, ২১-২৩।

৩০. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ , *প্রাগুক্ত*, ২৪।

৩১. মোহাম্মদ আমীন, *চকরিয়ার ইতিহাস* (প্রকাশক: আনোয়ার হোসেন কন্ট্রাক্টর, চট্টগ্রাম, জুন ২০০২), ৪২।

৩২. মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (কোম্পানী আমল), (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৬), ৮১-৮২।

৩৩. H. J. S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong*, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880), 233.

৩৪. ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, আগস্ট ২০১১, পৃ. ৬৮-৮১।

৩৫. Willem Van Schendel(edited), *Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798)*, (Dhaka: UPL, 1992), 41-42.

৩৬. সলিমুল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*, ১৫।

৩৭. জামাল উদ্দিন, *শাশ্বত চট্টগ্রাম*, (চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, মে ২০১৫), ২২।

৩৮. আবদুল হালিম মিয়া (গ্রন্থনা), *প্রাগুক্ত*, ৩৬১।

৩৯. জাহেদ সরওয়ার (সম্পদনা ও সংগ্রহ), *আলোকিত মহেশখালী (স্মরণীয় ও বরণীয় যাঁরা)*, ঢাকা: দ্বীপালোক, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, ১১।

৪০. 'মহেশখালীতে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ', *প্রথম আলো*, ১৬ জুলাই, ২০১৯।

৪১. মোহাম্মদ শাহ আলম, *সাগর তনয়া মহেশখালী*, (চট্টগ্রাম: গলুই প্রকাশন, ২০১৯), ২৬।

৪২. সাদাত উল্লাহ খান, 'প্রথম মহেশখালি লেখক উৎসব ও বইমেলা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি', বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-২০১৫, সম্পাদক: সাদাত উল্লাহ খান, ঢাকা: বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, মার্চ-আগস্ট ২০১৫, ২৮-৪৪।

৪৩. শাওয়াল খান, বিষয় মহেশখালি: গন্তব্য কোথায়?' *আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৭ নভেম্বর ২০১৭।

৪৪. এন. এম. হাবীব উল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, ১-১৬।

৪৫. সাদাত উল্লাহ খান ও শাওয়াল খান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৬০।

৪৬. Abdul Karim, *The Rohinga: A Short Account of their History and Culture*, (Chittagong: Arakan Historical Society, June 2000), 5.

৪৭. অমিত চৌধুরী (সম্পাদিত), *গবেষক আব্দুল হক চৌধুরী কর্মকৃতি মূল্যায়ন*, (চট্টগ্রাম: মূল্যায়ন প্রকাশনা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫), ১৩৩-১৩৪।

৪৮. সুণীতিভূষণ কানুনগো, *'চট্টগ্রামের মগ শাসন'*, ইতিহাস পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪, ৮৭-৯২।

৪৯. কমলেশ দাশগুপ্ত, *প্রাচীন চট্টগ্রাম ও সেকালের হিন্দু সমাজ*, প্রকাশক: দীলিপ দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম, ২০১৮, ৪২।

৫০. আবুল কাসেম, *রামুর ইতিহাস: ইংরেজ আমল পর্যন্ত*, (কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪), ১৫।

৫১. L. S. S. Malley, *Eastern Bengal District Gazetters Chittagong*, (Calcutta: The Bengal Secretarieat book, 1908), 187.

৫২. লা মং, 'মহেশখালী রাখাইনদের ইতিকথা', *মাটির মায়া: গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক-২০০৮*, মহেশখালী সমিতি, চট্টগ্রাম, ২৯।

৫৩. সুণীতিভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, (ঢাকা: বাতিঘর সংস্করণ, আগস্ট, ২০১৯), ৯৯।

৫৪. *প্রথম আলো*, ১৬ জুলাই, ২০১৯।

৫৫. 'অনন্য এ দ্বীপকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নিন', *প্রথম আলো*, ১৯ জুলাই, ২০১৯।

৫৬. সলিমুল্লাহ খান, 'ভূমিকা: বিষণ্ন মহেশখালি', *প্রাগুক্ত*, ১৫।